ফেলুদা সমগ্র

কৈলাস চৌধুরীর পাথর

সত্যজিৎ রায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

- কৈলাস চৌধুরীর পাথর - ০১ 2
- কৈলাস চৌধুরীর পাথর - ০২ 18
- কৈলাস চৌধুরীর পাথর - ০৩ 21
- কৈলাস চৌধুরীর পাথর - ০৪ 27
- কৈলাস চৌধুরীর পাথর - ০৫ 32

কৈলাস চৌধুরীর পাথর – ০১

‘কার্ডটা কীরকম হয়েছে দ্যাখ তো।’

ফেলুদা ওর মানিব্যাগের ভিতর থেকে সড়াৎ করে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে আমায় দেখতে দিল। দেখি তাতে ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে Prodosh C. Mitter, Private Investigator। বুঝতে পারলাম ফেলুদা এবার তার গোয়েন্দা গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারটা বেশ ফলাও করে জাহির করছে। আর তা করবে নাই বা কেন। বাদশাহি আংটির শয়তানকে ফেলুদা যে-ভাবে শায়েস্তা করেছিল, সে কথা ও ইচ্ছে করলে সকলকে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াতে পারত। তার বদলে ও শুধু একটি ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়েছে এই তো!

ফেলুদার নাম আপনা থেকেই বেশ রটে গিয়েছিল। আমি জানি ও এর মধ্যে দু তিনটে রহস্যের ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরির অফার পেয়েছে, কিন্তু কোনওটাই ওর মনের মতো হয়নি বলে না করে দিয়েছে।

কার্ডটা ব্যাগের মধ্যে পুরে রেখে পা দুটো টেবিলের উপর তুলে লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল, ‘বড়দিনের ছুটিতে কিছুটা মাথা খাটানোর প্রয়োজন হবে বলে মনে হচ্ছে।’

আমি বললাম, ‘নতুন কোনও রহস্য বুঝি?’

ফেলুদার কথাটা শুনে ভীষণ এক্সাইটেড লাগছিল—কিন্তু বাইরে সেটা একদম দেখালাম না।

ফেলুদা তার প্যান্টের পাশের পকেট থেকে একটা ছোট্ট কৌটো বার করে তার থেকে খানিকটা মাদ্রাজি সুপুরি নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে বলল, ‘তোর খুব উত্তেজিত লাগছে বলে মনে হচ্ছে?’

সে কী, ফেলুদা বুঝল কী করে?

ফেলুদা নিজেই আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিল। ‘কী করে বুঝলাম ভাবছিস? মানুষ তার মনের ভাব যতই গোপন করার চেষ্টা করুন না কেন, তার বাইরের ছোটখাটো হাবভাব

থেকেই সেটা ধরা পড়ে যায়। কথাটা যখন তোকে বললাম, ঠিক সেই সময়টা তোর একটা হাই আসছিল। কিন্তু কথাটা শুনে মুখটা খানিকটা খুলেই বন্ধ হয়ে গেল। তুই যদি আমার কথায় উত্তেজিত না হতিস, তা হলে যথারীতি হাইটা তুলতিস—মাঝপথে থেমে যেতিস না।'

ফেলুদার এই ব্যাপারগুলো সত্যিই আমাকে অবাক করে দিত। ও বলত, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা না থাকলে ডিটেকটিভ হবার কোনও মানে হয় না। এ ব্যাপারে যা খাঁটি কথা বলার সবই শার্লক হোমস বলে গেছেন। আমাদের কাজ শুধু তাঁকে ফলো করা।'

আমি বললাম, 'কী কাজে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে বললে না?'

ফেলুদা বলল, 'কৈলাস চৌধুরীর নাম শুনেছিস? শ্যামপুকুরের কৈলাস চৌধুরী?'

আমি বললাম, 'না, শুনিনি। কত বিখ্যাত লোক আছে কলকাতা শহরে—তার ক' জনের নামই বা আমি শুনেছি। আর আমার তো সবেমাত্র পনেরো বছর বয়স।'

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'এরা রাজসাহিতে বড় জমিদার ছিল। কলকাতায় বাড়ি ছিল; পাকিস্তান হবার পর এখানে চলে আসে। কৈলাসবাবুর পেশা হচ্ছে ওকালতি। তা ছাড়া শিকারি হিসাবে নামডাক আছে। দুখানা শিকারের বই লিখেছেন। এই কিছুদিন আগে জলদাপাড়া রিজার্ভ ফরেস্টে একটা হাতি পাগল হয়ে গিয়ে উৎপাত আরম্ভ করেছিল। উনি গিয়ে সেটাকে মেরে এলেন। কাগজে নামটাম বেরিয়েছিল।'

'কিন্তু তোমার মাথা খাটাতে হচ্ছে কেন? ভদ্রলোকের জীবনে কোনও রহস্য আছে নাকি?'

ফেলুদা জবাব না দিয়ে তার কোটের বুক পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে আমাকে দিল।

'পড়ে দ্যাখ।'

আমি চিঠির ভাঁজ খুলে পড়ে দেখলাম। তাতে এই লেখা ছিল—

'শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মিত্র সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতবাজার পত্রিকায় আপনার বিজ্ঞাপন দেখিয়া আপনাকে এই পত্র দেওয়া স্থির করিলাম। আপনি উপরোক্ত ঠিকানায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বাধিত হইব।

কারণ সাক্ষাতে বলিব। আমি এক্সপ্রেস ডেলিভারি যোগে এই পত্রে পাঠাইতেছি, সুতরাং আগামীকল্য ইহা আপনার হস্তগত হইবে। আমি পরশু অর্থাৎ, শনিবার, সকাল ১০টায় আপনার আগমন প্রত্যাশ করিব। ইতি ভবদীয় শ্রীকৈলাশচন্দ্র চৌধুরী।'

চিঠিটা পড়ামাত্র আমি বললাম, 'শনিবার সকাল দশটা মানে তো আজই, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই।'

ফেলুদা বলল, 'তোর দেখছি বেশ ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। তারিখ-টারিখগুলো বেশ খেয়াল রাখছিস।'

আমার মনে এর মধ্যেই একটা সন্দেহ জেগে উঠেছে। বললাম, 'তোমাকেই যখন ডেকেছে, তখন কি আর সঙ্গে অন্য কেউ...'

ফেলুদা চিঠিটা আমার হাত থেকে নিয়ে সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে রেখে বলল, 'তোর বয়সটা কম বলেই হয়তো তোকে সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে। কারণ তোকে হয়তো মানুষ বলেই ধরবেন না ভদ্রলোক। কাজেই সামনে কথাবার্তা বলতে আপত্তি করবেন না। যদি করেন, তা হলে তুই না হয় পাশের ঘরে-টরে কোথাও অপেক্ষা করিস, সেই ফাঁকে আমরা কথা সেরে নেব।'

আমার বুকের মধ্যে টিপ টিপ শুরু হয়ে গিয়েছে। ছুটিটা কী করব কী করব ভাবছিলাম। এখন মনে হচ্ছে হয়তো দারুণ ইন্টারেস্টিং ভাবেই কেটে যাবে।

দশটা বাজতে পাঁচ মিনিটে আমরা ট্রামে করে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট আর শ্যামপুকুর স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছলাম। পথে একবার ট্রাম থেকে নেমে ফেলুদা দাসগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে কৈলাস চৌধুরীর লেখা একটা শিকারের বই কিনেছিল, সেটার নাম 'শিকারের নেশা'। বাকি পথটা বইটা উলটেপালটে দেখল। ট্রাম থেকে নামার সময় সেটা কাঁধে ঝোলানো থলির মধ্যে রেখে বলল, 'এমন সাহসী লোকের কেন ডিটেকটিভের দরকার পড়েছে কে জানে।'

একান্ন নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রিট, একটা মস্ত পুরনো আমলের ফটকওয়ালা বাড়ি—যাকে বলে অট্টালিকা। সামনের দিকে বাগান, ফোয়ারা, পাথরের মূর্তি ইত্যাদি পেরিয়ে বাড়ির দরজায় কলিং বেল টাপার আধ মিনিটের মধ্যেই ভিতর থেকে পায়ের আওয়াজ পালাম।

দরজা খুলতে দেখি একজন ভদ্রলোক, যাকে দেখে কেন জানি মনে হল, তিনি তখনই কৈলাসবাবু নন, কারণ বাঘ মারা মানুষের এমন গোবেচারা চেহারা হতেই পারে না। মাঝারি সাইজের মোটা-সোটা ফরসা ভদ্রলোক বয়স ত্রিশের বেশি বলে মনে হয় না। চোখের চাহনিতে কেমন জানি একটা সরল, ছেলেমানুষি ভাব। লক্ষ করলাম ভদ্রলোকের হাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস রয়েছে।

'কাকে চান আপনারা?' গলার আওয়াজ দেখলাম মানানসই রকমের মিহি ও নরম।

ফেলুদা একটা কার্ড বার করে ভদ্রলোককে দিয়ে বলল, 'কৈলাসবাবুর সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। উনি চিঠি দিয়েছিলেন।'

ভদ্রলোক কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে বললেন, 'আসুন ভিতরে।'

দরজা দিয়ে ঢুকে একটা সিঁড়ি পেরিয়ে ভদ্রলোক একটা আপিস ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে বললেন।

'আপনারা একটু বসুন—মাঝি মামাবাবুকে খবর নিচ্ছি।'

বহুদিনের পুরনো একটা কালো টেবিলের সামনে দুটো পুরনো হাতলওয়ালা চেয়ারে আমরা বসলাম। ঘরের তিনটিকে আলমারি বোঝাই পুরনো বই। সামনে টেবিলের উপর নজর যেতে একটা মজার জিনিস দেখলাম। তিনখানা মোটা স্ট্যাম্প অ্যালবাম একটার উপর আরেকটা স্তূপ করে রাখা রয়েছে, আরেকটা অ্যালবাম খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, যাতে সারি সারি স্ট্যাম্প যত্ন করে আটকানো রয়েছে। কয়েকটা সেলোফেনের মধ্যে কিছু আলগা স্ট্যাম্পও রয়েছে, আর তা ছাড়ে রয়েছে স্ট্যাম্প-কালেকটারদের অত্যন্ত দরকারি ও আমার খুব চেনা কয়েকটা জিনিস, যেমন হিঞ্জ, চিমটে, স্ট্যাম্পের ক্যাটালগ ইত্যাদি। এখন বুঝতে পারলাম ভদ্রলোকের হাতের ম্যাগনিফাইং গ্লাসটাও এই কাজেই ব্যবহার হয়, আর তিনিই এই সব স্ট্যাম্পের কালেকটর।

ফেলুদাও এই সবের দিকেই দেখছিল, কিন্তু ও নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু কথা হবার আগেই ভদ্রলোক ফিরে এসে বললেন, 'আপনারা বৈঠকখানায় এসে বসুন, মামা এক্ষুনি আসছেন।'

মাথার উপর বিরাট ঝাড়লণ্ঠনওয়ালা বৈঠকখানায় গিয়ে আমরা দু'জনে সাদা খোলস দিয়ে ঢাকা একটা প্রকাণ্ড সোফার উপরে বসলাম। ঘরের চারিদিকে পুরনো বড়লোকি ছাপ। একবার বাবার সঙ্গে বেলেঘাটার মল্লিকদের বাড়িতে ঠিক এইরকম সব আসবাব, পেন্টিং, মূর্তি আর ফুলদানির ছড়াছড়ি দেখেছিলাম। এছাড়া রয়েছে মেঝের উপর একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছাল আর দেয়ালে চারটে হরিণ, দুটো চিতাবাঘ আর একটা মহিষের মাথা।

প্রায় দশ মিনিট বসে থাকার পর একজন মাঝবয়সী কিন্তু বেশ জোয়ান গোছের ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। তাঁর রং ফরসা, নাকের তলায় সরু গোঁফ আর গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি পায়জামা আর ড্রেসিং গাউন।

আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। ভদ্রলোক আমাকে দেখে যেন ভুরুটা একটু কপালে তুললেন। ফেলুদা বলল, 'এটি আমার খুড়তুতো ভাই।'

ভদ্রলোক আমাদের পাশের সোফাতে বসে বললেন, 'আপনারা কি দুজনে একসঙ্গে ডিটেকটিভিগিরি করেন?'

ফেলুদা হেসে বলল, 'আজ্ঞে না। তবে ঘটনাচক্রে আমার সব কটা কেসের সঙ্গেই তপেশ জড়িত ছিল। ও কোনও অসুবিধা করেনি কখনও।'

'বেশ।...অবনীশ, তুমি যেতে পারো। এদের জন্যে একটু জলযোগের ব্যবস্থা দেখো।'

স্ট্যাম্প-জমানো ভদ্রলোকটি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন; তিনি তাঁর মামার আদেশ শুনে চলে গেলেন। কৈলাস চৌধুরী ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না আমার চিঠিটা কি আপনি সঙ্গে এনেছেন?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'আমিই যে প্রদোষ মিত্তির সেটার প্রমাণ চাইছেন তো? এই যে আপনার চিঠি।'

ফেলুদা পকেট থেকে কৈলাসবাবুর চিঠিটা বার করে ভদ্রলোকের হাতে দিল। উনি সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে ফেলুদাকে ফেরত দিয়ে দিলেন।

'এ সব প্রিকশন নিতেই হয়, বুঝতেই পারছেন। যাই হোক—শিকারি বলে আমার একটা নামডাক আছে জানেন বোধ হয়।'

ফেলুদা বলল, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

ঘরের দেয়ালে জানোয়ারের মাথাগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ‘এগুলো সব আমারই শিকার। সতেরো বছর বয়সে বন্দুক চালাতে শিখি। তার আগে অবিশ্যি এয়ার গান দিয়ে পাখি-টাখি মেরেছি। সম্মুখ সমরে জানোয়ার কোনওদিন আমার সঙ্গে পেরে উঠবে বলে মনে হয় না। কিন্তু...যে অদৃশ্য ও অজ্ঞাত—সে আমাকে বড় ভাবিয়ে তোলে।’

ভদ্রলোক একটু থামলেন। আমার বুকের ভিতরটায় আবার টিপটিপ শুরু হয়েছে। জানি এক্ষুণি ভদ্রলোক রহস্যের কথাটা বলবেন, কিন্তু এত কায়দা করে আস্তে আস্তে আসল কথাটায় যাচ্ছেন যে তাতে যেন সাসপেন্স আরও বেড়ে যায়।

কৈলাসবাবু আবার শুরু করলেন।

‘আপনার বয়স যে এত কম তা জানা ছিল না। কত হবে বলুন তো?’

ফেলুদা বলল, ‘টুয়েন্টি এইট।’

‘কাজেই, যে কাজের ভার আপনাকে দিতে যাচ্ছি সেটা আপনার পক্ষে কতদূর সম্ভব তা জানি না। পুলিশকে আমি এ ব্যাপারে জড়াতে চাই না, কারণ এর আগে আরেকটা ব্যাপারে তাদের সাহায্য নিয়ে ঠকেছি। ওরা অনেক সময় কাজের চেয়ে অকাজটা করে বেশি, আর এটাও ঠিক যে আমি তরুণদের অশ্রদ্ধা করি না। কাঁচা বয়সের সঙ্গে পাকা বুদ্ধির সমাবেশটা খুব জোরাল হয় বলেই আমার বিশ্বাস।’

এবারে কৈলাসবাবুর থামার সুযোগ নিয়ে ফেলুদা গলা খাঁকরিয়ে বলল, ‘ঘটনাটা কী সেটা যদি বলেন...।’

কৈলাসবাবু এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, ‘দেখুন তো এটা পরে কী বোঝেন।’

ফেলুদা কাগজটা খুলে ধরতে আমি পাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে সেটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। তাতে ইংরেজিতে যা লেখা রয়েছে তার মানে হয় এই ‘পাপের বোঝা বাড়িয়ো না। যে জিনিসে তোমার অধিকার নেই, সে-জিনিস তুমি আগামী সোমবার বিকেল চারটের মধ্যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ গেটের বিশ হাতে ভিতর দিকে, রাস্তার বাঁ ধারে লিলি

ফুলের প্রথম সারির প্রথম গাছটার নীচে রেখে আসবে। আদেশ অমান্য করার, বা পুলিশ-গোয়েন্দার সাহায্য নেওয়ার ফল ভাল হবে না—তোমার অনেক শিকারের মতোই তুমিও শিকারে পরিণত হবে একথা জেনে রেখো।'

'কী মনে হয়?' গম্ভীর গলায় কৈলাসবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা দেখে বলল, 'হাতের লেখা ভাঁড়ানো হয়েছে, কারণ একই অক্ষর দু-তিন জায়গায় দু-তিন রকম ভাবে লেখা হয়েছে। আর, নতুন প্যাডের প্রথম কাগজে লেখা।'

'সেটা কী করে বুঝলেন?

'প্যাডের কাগজে লেখা হলে তার পরের কাগজে সে লেখার কিছুটা ছাপ থেকে যায়। এ কাগজ একেবারে মসৃণ।'

'ভেরি গুড। আর কিছু?'

'আর কিছু এ থেকে বলা অসম্ভব। এ চিঠি ডাক্তে এসেছিল?'

'হ্যাঁ। পোস্টমার্ক পার্ক স্ট্রিট। তিনদিন আগে এ চিঠি পেয়েছি। আজ শনিবার ২০শে।'

ফেলুদা চিঠিটা ফেরত দিয়ে বলল, 'এবার আপনাকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই, কারণ আপনার শিকারের কাহিনী ছাড়া আপনার সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই আমার।'

'বেশ তো। করুন না। মিষ্টি মুখে পুরে খেতে খেতে করুন' ।

চাকর রুপোর প্লেটে রসগোল্লা আর অমৃতি রেখে গেছে। ফেলুদাকে খাবার কথা বলতে হয় না। সে টপ করে একটা আস্ত রসগোল্লা মুখে পুরে দিয়ে বলল, 'চিঠিতে যে জিনিসটার কথা লেখা হয়েছে সেটা কী জানতে পারি?'

কৈলাসবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন—যাতে আমার অধিকার নেই, এমন কোনও জিনিস আমার কাছে আছে বলে আমার জানা নেই। এ বাড়িতে যা কিছু আছে তা সবই হয় আমার নিজের কেনা, না হয় পৈতৃক সম্পত্তি। আর তার মধ্যে এমন কোনও জিনিস নেই যেটা আদায় করার জন্যে কেউ আমাকে এমন চিঠি দিতে পারে। তবে একটিমাত্র জিনিস আছে যেটা বলতে পারেন মূল্যবান ও লোভনীয়।'

'সেটা কী?'

'একটা পাথর।'

'পাথর?'

'প্রেশাস স্টোন।'

'আপনার কেনা?'

'না, কেনা নয়।'

'পৈতৃক সম্পত্তি?'

'তাও না। পাথরটা পাই আমি মধ্যপ্রদেশে চাঁদার কাছে একটা জঙ্গলে। একটা বাঘ ধাওয়া করে আমরা তিন-চার জন একটা জঙ্গলে ঢুকেছিলাম। শেষ পর্যন্ত সেটাকে মারা হয়। কাছেই একটা বহু পুরনো ভাঙা পরিত্যক্ত মন্দিরে একটা দেবমূর্তির কপালে পাথরটা লাগানো ছিল। ওটার অস্তিত্ব বোধহয় আমাদের আগে কেউই জানত না।'

'ওটা কি আপনার চোখেই প্রথম পড়ে?'

'মন্দিরটা সকলেই দেখেছিল, তবে পাথরটা প্রথম আমিই দেখি।'

'সঙ্গে আর কে ছিল সেবার?'

'রাইট বলে এক মার্কিন ছোকরা, কিশোরীলাল বলে এক পাঞ্জাবি, আর আমার ভাই কেদার।'

'আপনার ভাইও শিকার করেন?'

'করত। এখন করে কি না জাই না। বছর চারেক হল ও বিদেশে।'

'বিদেশ মানে?'

' সুইজারল্যাণ্ড! ঘড়ির ব্যবসার ধান্দায়।'

'যখন পাথরটা পেলেন তখন ওটা নিয়ে আপনাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি হয়নি?'

'না। তার কারণ ওটার যে কত দাম সেটা কলকাতায় এসে জহুরিকে দেখাবার পর জানতে পারি।'

'তারপর সে খবর আর কে জেনেছে?'

'খুব বেশি লোককে বলিনি। এমনিতে আত্মীয়-স্বজন বিশেষ কেউ নেই। দু-একজন উকিল বন্ধুকে বলেছি, কেদার জানত, আর বোধহয় আমার ভাগনে অবনীশ জানে।'

'পাথরটা বাড়িতেই আছে?'

'হ্যাঁ। আমার ঘরেই থাকে।'

'এত দামি জিনিস ব্যাঙ্কে রাখেন না যে?'

'একবার রেখেছিলাম। যেদিন রেখেছিলাম তার পরের দিনই একটা মোটর অ্যাক্সিডেন্ট হয়—প্রায় মরতে মরতে বেঁচে যাই। তারপর থেকে ধারণা হয় ওটা কাছে না রাখলে ব্যাড লাক্ আসবে, তাই ব্যাঙ্ক থেকে আনিয়ে নিই।'

'হুঁ...।'

ফেলুদার খাওয়ার শেষ হয়ে গেছে। ওর ভ্রুকুটি দেখে বুঝলাম ও ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছে। জল খেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?'

' আমি, আমার ভাগনে অবনীশ, আর তিনটে পুরনো চাকর। আর আমার বাবাও আছেন, তবে তিনি একেবারে অথর্ব, জরাগ্রস্থ। একটি চাকর তার পিছনেই লেগে থাকে সারাক্ষণ।'

'অবনীশবাবু কী করেন?'

'বিশেষ কিছুই না। ওর নেশা ডাকটিকিট সংগ্রহ করা। বলেছে একটা টিকিটের দোকান করবে।'

ফেলুদা একটু ভেবে মনে মনে কী জানি হিসাব করল, 'আপনি কি চাইছেন আমি এই পত্রলেখকের অনুসন্ধান করি?'

কৈলাসবাবু যেন একটু জোর করেই হেসে বললেন। 'বুঝতেই তো পারছেন এই বয়সে এ ধরনের অশান্তি কি ভাল লাগে? আর শুধু যে চিঠি লিখছে তা নয়—কাল রাত্রে একটা টেলিফোনও করেছিল। ইংরেজিতে ওই একই কথা বলল। গলা শুনে চিনতে পারলাম না। কী বলল জানেন? বলল, নির্দিষ্ট জায়গায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জিনিসটা রেখে না এলে আমার বাড়িতে এসে আমাকে ঘায়েল করে দিয়ে যাবে। অথচ এ পাথর হাতছাড়া করতে আমি মোটেই রাজি নই। তা ছাড়া লোকটার যখন ন্যায্য দাবি নেই, অথচ হুমকি দিচ্ছে—তখন বুঝতে হবে সে বদমাইশ, সুতরাং তার শাস্তি হওয়ার দরকার। সেটা কী করে সম্ভব সেটাই আপনি একটু ভেবে দেখুন।'

'উপায় তো একটাই। বাইশ তারিখে সন্ধ্যাবেলা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশেপাশে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। তাকে তো আসতেই হবে।'

'সে নিজে নাও আসতে পারে।'

'তাতে ক্ষতি নেই। যে-ই এসে লিলি গাছের পাশে ঘুরঘুর করুক না কেন, সে যদি আসল লোক নাও হয়, তাকে ধরতে পারলে আসল লোকের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব হবে না।'

'কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না। লোকটা ডেনজারাস হতে পারে। সে যখন দেখবে লিলি গাছের তলায় পাথরটা নেই, তখন যে কী করতে পারে তা বলা যায় না। তার চেয়ে বাইশ তারিখের আগে—অর্থাৎ আজ আর কালের মধ্যে এই লোকটি কে তা যদি জানা সম্ভব হত তা হলে খুবই ভাল হত। এই চিঠি, আর ওই একটা টেলিফোন কল এই দুটো থেকে কিছু বার করা যায় না?'

ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে দিয়েছে। ও বলল, 'দেখুন কৈলাসবাবু, চিঠিতে সে লিখেছে যে, গোয়েন্দার সাহায্য নিলে ফল ভাল হবে না—সুতরাং আমি কিছু করি বা না করি, আপনি যে আমাকে ডেকেছেন, এতেই আপনার বিপদের একটা আশঙ্কা আছে। সুতরাং আপনি বরঞ্চ ভেবে দেখুন যে আমাদের সাহায্য চান কি না।'

কৈলাসবাবু ঠাণ্ডার মধ্যেও রুমাল দিতে তাঁর কপাল মুছে বললেন, 'আপনি, এবং আপ্নার সঙ্গে আপনার ভাইটি—এ দুজনকে দেখলে কেউ মনে করবে না যে আপনাদের সঙ্গে গোয়েন্দার কোনও সম্পর্ক আছে। এটা একটা অ্যাডভানটেজ। আপনার নাম লোকে জেনে থাকলেও, আপনার চেহারা জানে কি? মনে তো হয় না। সুতরাং সেদিকে আমার বিশেষ ভয় নেই। আপনি রাজি হলে কাজটা নিন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমি দেব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। তবে যাবার আগে একবার পাথরটা দেখে যেতে চাই!'

'নিশ্চয়ই।'

কৈলাসবাবুর পাথর ওঁর শোবার ঘরে আলমারির ভিতর থাকে। আমরা ভদ্রলোকের পিছন পিছন একটা শানবাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় পৌঁছলাম। সিঁড়িটা গিয়ে পড়েছে একটা লম্বা, অন্ধকার বারান্দায়। তার দুদিকে সারি সারি প্রায় দশ-বারোটা ঘর, তার

অনেকগুলো আবার তালা-বন্ধ। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব, আর লোকজন নেই বলেই বোধ হয় সামান্য একটু আওয়াজ হলেই তার প্রতিধ্বনি হয়।
বারান্দার শেষ মাথায় ডানদিকের ঘর হল কৈলাসবাবুর শোবার ঘর। আমরা যখন বারান্দার মাঝামাঝি এসেছি তখন দেখি পাশের একটা ঘরের দরজা অর্ধেক খোলা, আর তার ভিতর দিয়ে একজন ভীষণ বুড়ো লোক গলা বাড়িয়ে ঘোলাটে চোখে আমাদের দিকে দেখছে। আমার তো দেখেই কীরকম ভয় ভয় করতে লাগল। কৈলাসবাবু বললেন, 'উনিই আমার বাবা। মাথার ঠিক নেই। সব সময়েই এখন দিয়ে ওখান দিয়ে উঁকি মারেন।'
কাছাকাছি যখন এসেছি, তখন বুড়োর চাহনি দেখে সত্যিই আমার রক্ত জল হয়ে গেল। আর সেই ভয়াবহ চাহনি দিয়ে উনি তাকিয়ে রয়েছেন কৈলাসবাবুর দিকে।
বাবার ঘর পেরিয়ে কিছুদির গেলে পর কৈলাসবাবু বললেন, 'বাবার সকলের উপরেই আক্রোশ। ওঁর ধারণা সকলেই ওঁকে নেকলেক্ট করে। আসলে কিন্তু ওঁর দেখাশোনার ত্রুটি হয় না।'
কৈলাসবাবুর ঘরে দেখলাম প্রকাণ্ড উঁচু খাট, আর তার মাথার দিকে ঘরের কোনায় আলমারি। সেটা খুলে তার দেরাজ থেকে একটা নীল ভেলভেটের বাক্স বার করে বললেন, 'সাতরামদাসের দোকান থেকে এই বাক্সটা দিনে নিয়েছিলুম এই পাথরটা রাখার জন্য।'
বাক্সটা খুলে নীল আর সবুজ রং মেশানো লিচুর সাইজের একটা ঝলমলে পাথর বার করে কৈলাসবাবু ফেলুদার হাতে দিয়ে বললেন–
'একে বলে ব্লুবেরিল। ব্রেজিল দেশে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে যে খুব বেশি আছে তা নয়। অন্তত এত বড় সাইজের বেশি নেই সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।'
ফেলুদা পাথরটা হাতে নিয়ে এদিক ওদিক নাড়িয়ে দেখে ফেরত দিয়ে দিল। এবার কৈলাসবাবু তাঁর পকেট থেকে একটা মানিব্যাগ বার করলেন। তারপর তার থেকে পাঁচটা দশটাকার নোট বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এইটে আগাম। কাজটা ভালয় ভালয় উতরে গেলে বাকিটা দেব, কেমন?'
'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে ফেলুদা নোটগুলো পকেটে পুরে নিল। চোখের সামনে ওকে রোজগার করতে এই প্রথম দেখলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে ফেলুদা বলল, ‘আমাদের ওই চিঠিখানা আমাকে দিতে হবে, আর অবনীশবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলব।’

নীচে যখন পৌঁছলাম, ঠিক সেই সময় বৈঠকখানা থেকে টেলিফোন বাজতে আরম্ভ করেছে। কৈলাশবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ফোনটা ধরলেন।

‘হ্যালো।’

তারপর আর কোনও কথা নেই। আমরা বৈঠকখানায় ঢুকতেই কৈলাসবাবু ফ্যাকাশে মুখ করে ধপ করে টেলিফোনটা রেখে দিয়ে বললেন, ‘আবার সেই লোক, সেই হুমকি।’

‘কী বলল?’

‘এবার আর কোনও সন্দেহ রাখেনি।’

‘তার মানে?’

‘বলল—কোন জিনিসটা চাইছি বুঝতে পারছ বোধহয়। চাঁদার জঙ্গলের মন্দিরে যেটা ছিল সেইটে।’

‘আর কী বলল?’

‘আর কিছু না।’

‘গলা চিনলেন?’

‘না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে গলাটা শুনতে ভাল লাগে না। আপনি বরং আরেকবার ভেবে দেখুন।’

ফেলুদা একটু হেসে বলল, ‘আমার ভাবা হয়ে গিয়েছে।’

কৈলাসবাবুর কাছ থেকে অবনীশবাবুর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে টেবিলের উপর রাখা কী একটা জিনিস খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করছেন। আমরা ঢুকতেই টেবিলের উপর হাতটা চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

‘আসুন, আসুন!’

ফেলুদা বলল্‌ ‘আপনার ডাকটিকিটের খুব শখ দেখছি।’

অবনীশবাবুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। ‘আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই আমার একমাত্র নেশা। বলতে গেলে আমার ধ্যান জ্ঞান চিন্তা।’

'আপনি কি কোনও দেশ নিয়ে, স্পেশালাইজ করেন, না সারা পৃথিবীর টিকিট জমান?'

' আগে সারা পৃথিবীরই জমাতুম, কিন্তু কিছুদিন হল ইন্ডিয়াতে স্পেশালাইজ করছি। আমাদের এই বাড়ির দপ্তরে যে কী আশ্চর্য সব পুরনো টিকিট রয়েছে তা বলতে পারি না। অবিশ্যি বেশির ভাগই ইন্ডিয়ার। গত দু মাস ধরে হাজার হাজার পুরনো চিঠির গাদা ঘেঁটে টিকিট সংগ্রহ করেছি।'

'ভাল কিছু পেয়েছেন?'

'ভাল? ভাল?' ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আপনাকে বললে বুঝবেন? আপনার এ ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'একটা বয়সে তো সকলেই ওদিকটায় ঝোঁকে—তাই নয় কী? কেপ-অফ-গুড-হোপের এক পেনি, মরিশাসের দু পেনি আর ব্রিটিশ গায়নার ১৮৫৬ সনের সেই বিখ্যাত স্ট্যামগুলো পাবার স্বপ্ন আমিও দেখেছি। বছর দশেক আগে লাখ খানেক টাকা দাম ছিল ওগুলর। এখন আরও বেড়েছে।'

অবনীশবাবু উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

'তা হলে মশাই আপনি বুঝবেন। আপনাকে দেখাই। এই দেখুন!'

ভদ্রলোক তার চাপা হাতের তলা থেকে একটা ছোট্ট রঙিন কাগজ ফেলুদাকে দিলেন। দেখি খাম থেকে খোলা রং প্রায় মিলিয়ে যাওয়া একটা টিকিট।

'কী দেখলেন?' অবনীশবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, 'শ'খানেক বছরের পুরনো ভারতবর্ষের টিকিট। ভিক্টোরিয়ার ছবি। এ টিকিট আগে দেখেছি।'

'দেখেছেন তো? এবার এই গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দেখুন।'

ফেলুদা ম্যাগনিফাইং গ্লাস চোখে লাগাল।

'এবার কী দেখছেন?' ভদ্রলোকের গলায় চাপা উত্তেজনা।

'এতে তো ছাপার ভুল রয়েছে।'

'এগজ্যাক্টলি!'

' POSTAGE কথাটার G-এর জায়গায় C ছাপা হয়েছে।'

অবনীশবাবু টিকিট ফেরত নিয়ে বললেন, ‘তার ফলে এটার দাম কত হচ্ছে জানেন?’
‘ কত? ’
‘বিশ হাজার টাকা।’
‘বলেন কী?’
‘আমি বিলেত থেকে চিঠি লিখে খোঁজ নিয়েছি। এই ভুলটার উল্লেখ স্ট্যাম্প ক্যাটালতে নেই। আমিই প্রথম এটার অস্তিত্ব আবিষ্কার করলাম।’
ফেলুদা বলল, ‘কনগ্রাচুলেশন্‌স। কিন্তু আপনার সঙ্গে টিকিট ছাড়াও অন্য ব্যাপারে একটু আলোচনা ছিল।’
‘বলুন।’
‘আপনার মামা—কৈলাসবাবু—তাঁর যে একটা দামি পাথর আছে সেটা আপনি জানেন?’
অবনীশবাবুকে যেন কয়েক সেকেন্ড ভাবতে হল। তারপর বললে, ‘ও হ্যাঁ হ্যাঁ। শুনেছিলাম বটে। দামি কি না জানি না—তবে ‘লাকি’ পাথর সেটা একবার বলেছিলেন বটে। কিছু মনে করবেন না। আমার মাথায় এখন ডাকটিকিট ছাড়া কিচ্ছু নেই।’
‘আপনি এ বাড়িতে কদ্দিন আছেন?’
‘বাবা মারা যাবার পর থেকেই। প্রায় পাঁচ বছর।’
‘মামার সংগে আপনার গোলমান নেই তো?’
‘কোন মামা? এক মামা তো বিদেশে।’
‘আমি কৈলাসবাবুর কথা বলছি।’
“ও। ইনি অত্যন্ত ভাল লোক, তবে...’
‘তবে কী?’
অবনীশ ভুরু কুঁচকালেন।
‘ক’দিন থেকে—কোনও একটা কারণে—ওঁকে যেন একটু অন্যরকম দেখছি।’
‘কবে থেকে?’

'এই দু-তিন দিন হল। কাল ওঁকে আমার এই স্ট্যাম্পটার কথা বললাম–উনি যেন শুনেও শুনলেন না। অথচ এমনিতে রীতিমতো ইন্টারেস্ট নেন। আর তা ছাড়া, ওঁর কতগুলো অভ্যেস কীরকম যেন বদলে যাচ্ছে।'

'উদাহরণ দিতে পারেন?'

'এই যেমন, এমনিতে রোজ সকালে উঠে বাগানে পায়চারি করেন, গত দুদিন করেননি, ঘুম থেকে উঠেইছেন দেরিতে। বোধহয় রাত জাগছেন বেশি।'

'সেটার কোনও ইঙ্গিত পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। আমি তো একতলায় শুই। আমার ঠিক উপরের ঘরটাই মামার। পায়চারি করার শব্দ পেয়েছে মাঝ রাত্রে। গলার স্বরও পেয়েছি। বেশ জোরে। মনে হল ঝগড়া করছেন।'

'কার সঙ্গে?'

'বোধহয় দাদু। দাদু ছাড়া আর কে হবেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করারও শব্দ পেয়েছি। একদিন তো সন্দেহ করে সিঁড়ির নীচটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম মামা ছাত থেকে দোতলায় নামলেন, হাতে বন্দুক।'

' তখন কটা?'

'রাত দুটো হবে।'

'ছাতে কী আছে?'

'কিছুই নেই। কেবল একটা ঘর আছে–চিলেকোঠা যাকে বলে। পুরনো চিঠিপত্র কিছু ছিল ওটায়, সে সব আমি মাস খানেক হল বের করে এনেছি।'

ফেলুদা উঠে পড়ল। বুঝলাম তার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।

অবনীশবাবু বললেন, 'এ সব কেন জিজ্ঞেস করলেন বলুন তো?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'আপনার মামা কোনও কারণে একটু উদ্বিগ্ন আছেন। তবে সে নিয়ে আপনি ভাববেন না। আপনি স্ট্যাম্প নিয়েই থাকুন। এদিকের ঝামেলা মিটলে একদিন এসে আপনার কালেকশন দেখব' খন।'

কৈলাসবাবুর সঙ্গে একবার শেষ দেখা করে ফেলুদা বলল, 'আপনাকে ষোলো আনা ভরসা দিতে পারছি না, তবু এটুকু বলেছি যে আপনার ভাবনাটা আমায় ভাবতে দিন।

রাত্রে ঘুমোতে চেষ্টা করুন, দরকার হলে ওষুধ খেয়ে। আর ছাতে যাবেন না দয়া করে। এপাড়ার বাড়িগুল যেরকম ঘেঁষাঘেষি আপনার শত্রু পাশের কোনও বাড়িতে এসে আস্তানা গেড়ে থাকলে বিপদ হতে পারে।'

কৈলাশবাবু বললেন, 'ছাতে গিয়েছিলাম বটে, তবে সঙ্গে বন্দুক ছিল। একটা আওয়াজ পেয়েই গিয়েছিলাম, যদিও গিয়ে কিছুই দেখতে পাইনি।'

'বন্দুকটা সব সময়ই কাছে রাখেন তো?'

'তা রাখি। তবে মানুষের মনের উদ্বেগ অনেক সময় তার হাতের আঙুলে সঞ্চারিত হয় সেটা জানেন তো? বেশিদিন এইভাবে চললে আমার টিপের কী হবে জানি না।'

কৈলাস চৌধুরীর পাথর – ০২

পরের দিন ছিল রোববার। সারা দিনের মধ্যে বেশির ভাগটা সময় ফেলুদা ওর ঘরে পায়চারি করেছে। বিকেলে চারটে নাগাত ওকে পায়জামা ছেড়ে প্যান্ট পরতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি বেরোচ্ছ?'

ফেলুদা বলল, ' ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের লিলি গাছগুলো একবার দেখে আসব ভাবছি। যাবি তো চ।'

ট্রামে করে গিয়ে লোয়ার সারকুলার রোডের মোড়ে নেমে হাঁটতে হাঁটতে পাঁচটা নাগাত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ গেটটায় পৌঁছলাম। এদিকটায় লোকজন একটু কম আসে। বিশেষ করে সন্ধের দিকটায় যা লোক আসে সবই সামনের দিকে–মানে, উত্তরে–গড়ের মাঠের দিকে।

গেট দিয়ে ঢুকে বিশ হাতে আন্দাজ করে এগিয়ে গিয়ে দেখি বাঁ দিকে সত্যিই লিলি গাছের কেয়ারি। তার প্রথম সারির প্রথম গাছটার নীচেই পাথরটা রাখার কথা।

লিলি গাছের মতো এত সুন্দর জিনিস দেখেও গা-টা কেমন জানি ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। ফেলুদা বলল, 'কাকার একটা বাইনোকুলার ছিল না–যেটা সেবার দার্জিলিং নিয়ে গেছিলেন?'

আমি বললাম, 'আছে?'

মিনিট পনেরো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ঘুরে আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে গেলাম লাইটহাউসের সামনে। ফেলুদার কি সিনেমা দেখার শখ হল নাকি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিনেমায় না ঢুকে ও গেল উলটোদিকের একটা বইয়ের দোকানে। এ বই সে বই ঘেঁটে ফেলুদা দেখি একটা বিরাট মোটা স্ট্যাম্পের ক্যাটালগ নিয়ে তার পাতা উলটোতে আরম্ভ করল। আমি পাশ থেকে ফিসফিস করে বললাম, 'তুমি কি অবনীশবাবুকে সন্দেহ করছ নাকি?'

ফেলুদা বলল, 'এত যার স্ট্যাম্পের শখ, তার কিছুটা কাঁচা টাকা হাতে পেলে সুবিধে হয় বইকি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমরা যখন দোতলা থেকে একতলায় এলাম, তখন যে টেলিফোনটা এল, সেটা তো আর অবনীশবাবু করেননি।'

'না। সেটা করেছিল মসলন্দপুরের আদিত্যনারায়ণ সিংহ।'

বুঝলাম ফেলুদা এখন ঠাট্টার মেজাজে রয়েছে, ওর সংগে আপাতত আর এ-বিষয়ে কথা বলা চলবে না।

বাড়ি যখন ফিরলাম তখন আটটা বেজে গেছে। ফেলুদা কোটটা খুলে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে ফিয়ে বলল, 'আমি যতক্ষণ হাতমুখ ধুচ্ছি, তুই ডিরেক্টরি থেকে কৈলাসবাবুর টেলিফোন নাম্বারটা বার কর তো।'

ডিরেক্টরি হাতে নিয়ে টেলিফোনের সামনে বসা মাত্র ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠে আমায় বেশ চমকে দিল। আমাকেই ধরতে হয়। তুলে নিলাম রিসিভারটা।

'হ্যালো।'

'কে কথা বলছেন?'

এ কী অদ্ভুত গলা! এ গলা তো চিনি না! বললাম, 'কাকে চাই?'

কর্কশ গম্ভীর গলায় উত্তর এল, 'ছেলেমানুষ বয়সে গোয়েন্দাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করা হয় কেন? প্রাণের ভয় নেই?'

আমি ফেলুদাকে নাম ধরে ডাকতে গেলাম, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। কাঁপতে কাঁপতে টেলিফোনটা রেখে দেওয়ার আগে শুনতে পেলাম লোকটা বলল, 'সাবধান করে দিচ্ছি—তোমাকেও, তোমার দাদাকেও। ফল ভাল হবে না।'

আমি কাঠ হয়ে চেয়ারে বসে রইলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে ফেলুদা বলল, 'ও কী—ওরকম থুম মেরে বসে আছিস কেন? কার ফোন এসেছিল?'

কোনওমতে ঘটনাটা ফেলুদাকে বললাম। দেখলাম ও-ও গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর পিঠে একটা চাপড় মেনে বলল, 'ঘাবড়াস না। লোক থাকবে—পুলিশের লোক। বিপদের কোনও ভয় নেই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে একবার যেতেই হবে কালকে।'

রাত্রে ভাল ঘুম হল না। শুধু যে টেলিফোনের জন্য তা নয়; কৈলাসবাবুর বাড়ির ভিতরের অনেক কিছুই বার বার চোখের স্মাওনে ভেসে উঠছিল। সেই লোহার রেলিং দেওয়া ছাদ পর্যন্ত উঠে যাওয়া সিঁড়ি, দোতলার মার্বেল-বাঁধানো অন্ধকার লম্বা বারান্দা, আর তার দরজার ফাঁক দিয়ে বার করা কৈলাসবাবুর বাবার মুখ। কৈলাসবাবুর দিকে ওরকম ভাবে চেয়েছিলেন কেন তিনি? আর কৈলাসবাবু বন্দুক হাতে ছাতে গিয়েছিলেন কেন? কীসের শব্দ পেয়েছিলেন উনি?

ঘুমোতে যাবার আগে ফেলুদা একটা কথা বলেছিল—'জানিস, তোপসে—যারা চিঠি লিখে আর টেলিফোন করে হুমকি দেয়—তারা বেশির ভাগ সময় আসলে কাওয়ার্ড হয়।' এই কথাটার জন্যই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ঘুমটা এসে গেল।

কৈলাস চৌধুরীর পাথর – ০৩

পরদিন সকালে ফেলুদা কৈলাসবাবুকে ফোন করে বলল তিনি যেন নিশ্চিন্তে বাড়িতে বসে থাকেন; যা করবার ফেলুদাই করবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কখন যাবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে?'

ফেলুদা বলল, ' কাল যে সময় গিয়েছিলাম, সেই সময়। ভাল কথা, তোর স্কুলের ড্রইং-এর খাতা, পেনসিল-টেনসিল আছে তো?'

আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম।

'কেন, তা দিয়ে কী হবে?'

'আছে কি না বল না!'

'তা তো থাকতে হবেই।'

'সঙ্গে নিয়ে নিবি। লিলি গাছের উলটো দিকে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে তুই ছবি আঁকবি–গাছপালা, মেমোরিয়াল বিল্ডিং–যা হয় কিছু একটা। আমি হত তোর মাস্টার।'

ফেলুদার আঁকার হাত রীতিমতো ভাল। বিশেষ করে, মাত্র একবার যে-মানুষকে দেখেছে, পেনসিল দিয়ে খসখস করে মোটামুটি তার একটা পোর্ট্রেট আঁকার আশ্চর্য ক্ষমতা ফেলুদার আছে। কাজেই ড্রইংমাস্টারের কাজটা তার পক্ষে বেমানান হবে না।

শীতকালের দিন ছোট হয়, তাই আমরা চারটের কিছু আগেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পৌঁছে গেলাম। সোমবার ভিড়টা আরও কম। তিনটে পেরামবুলেটার সাহেবের বাচ্চাদের নিয়ে নেপানি আয়ারা ঘোরাঘেরা করছে; একটা পরিবারকে দেখে মাড়োয়ারি বলে মনে হয়; আর তা ছাড়া দু-একজন বুড়ো ভদ্রলোক। এদিকটায় আর বিশেষ কেউ নেই। কম্পাউন্ডের মধ্যেই, কিন্তু গেট থেকে বেশ কিছুটা দূরে চৌরঙ্গির দিকটায় একটা বড় গাছের তলায় আমরা দুজন প্যান্টপরা লোককে দেখলাম, যাদের দিকে দেখিয়ে ফেলুদা আস্তে করে আমায় কনুই দিয়ে একটা খোঁচা দিল। বুঝলাম ওরাই হচ্ছে পুলিশের লোক।

ওদের কাছে নিশ্চয়ই লুকোনো রিভলবার আছে। ফেলুদার সঙ্গে পুলিশের কিছু লোকের বেশ খাতির আছে এটা জানতাম।

লিলি ফুলের সারির উলটো দিকে কিছুটা দূরে খাতা-পেনসিল বার করে ছবি আঁকতে আরম্ভ করলাম। এ অবস্থায় কি আঁকায় মন বসে? চোখ আর মন দুটোই অন্য দিকে চলে যায়, আর ফেলুদা মাঝে মাঝে এসে ধমক দেয়, আর পেনসিল দিয়ে খসখস করে হিজিবিজি এঁকে দেয়—যেন কতই না কারেক্ট করছে! আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেই ফেলুদা বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে এদিক ওদিক দেখে।

সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। কাছেই গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। লোকজন কমে আসছে, কারণ একটু পরেই বেশ ঠাণ্ডা পড়বে। মাড়োয়ারিরা একটা বিরাট গাড়িতে উঠে চলে গেল। আয়াগুলোও পেরামবুলেটার ঠেলতে ঠেলতে রওনা দিল। লোয়ার সারকুলার রোড দিয়ে আপিস ফেরতা গাড়ির ভিড় আরম্ভ হয়েছে, ঘন ঘন হর্নের শব্দ কানে আসছে। ফেলুদা আমার পাশে এসে ঘাসের উপর বসতে গিয়ে বসল না। দেখলাম তার চোখ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের দিকে। আমি সেইদিকে চেয়ে গেটের বেশ কিছুটা বাইরে রাস্তার ধারে একজন ব্রাউন চাদর জড়ানো লোক ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। ফেলুদা চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে কিছুক্ষণ ওই দিকে দেখে বাইনোকুলারটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'দ্যাখ।'

'ওই চাদর গায়ে দেওয়া লোকটাকে?'

'হুঁ।'

বাইনোকুলার চোখে লাগাতেই লোকটা যেন দশ হাতের মধ্যে চলে এল, আর আমিও চমকে উঠে বললাম, 'এ কী—এ যে কৈলাসবাবু নিজে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!'

'হ্যাঁ। চল—নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজতে এসেছেন।'

কিন্তু আমরা রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম ভদ্রলোক হাঁটতে আরম্ভ করলেন। গেটের বাইরে এসে কৈলাসবাবুকে আর দেখা গেল না।

ফেলুদা বলল, 'চল শ্যামপুকুর। ভদ্রলোক বোধ হয় আমাদের দেখতে পাননি, আর না দেখে নিশ্চয়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।'

ট্যাক্সি পেলে ট্যাক্সিই নিতাম, কিন্তু আপিস টাইমে সেটা সম্ভব নয়, তাই ট্রাম ধরার মতলবে চৌরঙ্গির দিকে রওনা দিলাম। রাস্তা দিয়ে পর পর লাইন করে গাড়ি চলেছে। হঠাৎ ক্যালকাটা ক্লাবের সামনে এসে একটা কাণ্ড হয়ে গেল যেটা ভাবলে এখনও আমার ঘাম ছুটে যায়। কথা নেই বার্তা নেই, ফেলুদা হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান মেরে প্রায় আমাকে ছুঁড়ে রাস্তার একেবারে কিনারে ফেলে দিল। আর সেই সঙ্গে নিজেও একটা লাফ দিল। পরমুহূর্তে, দারুণ স্পিডে আর দারুণ শব্দ করে একটা গাড়ি আমাদের প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল।

'হোয়াট দ্য ডেভিল!' ফেলুদা বলে উঠল। 'গাড়ির নাম্বারটা...'

কিন্তু সেটার আর কোনও উপায় নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারের অন্য গাড়ির ভিড়ের মধ্যে সে গাড়ি মিলিয়ে গেছে। আমার হাতের খাতা-পেন্সিল কোথায় ছিটকে পড়েছে তার ঠিক নেই, তাই সেটা খুঁজে আর সময় নষ্ট করলাম না। এটা বেশ বুঝতে পারছিলাম যে ফেলুদা ঠিক সময় বুঝতে না পারলে আমরা দুজনেই নির্ঘাত গাড়ির চাকার তলায় চলে যেতাম।

ট্রামে ফেলুদা সারা রাস্তা ভীষণ গম্ভীর মুখ করে রইল। কৈলাসবাবুর বাড়িতে পৌঁছে সোজা বৈঠকখানায় গিয়ে সোফায় বসা কৈলাসবাবুকে ফেলুদা প্রথম কথা বলল, 'আপনি দেখতে পেলেন না আমাদের?'

ভদ্রলোক কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। বললেন, 'কোথায় দেখতে পেলাম না? কী বলছেন আপনি?'

'কেন, আপনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যাননি?'

' আমি? সে কী কথা! আমি তো এতক্ষণ শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে ভাবনায় ছটফট করেছিলুম—এই সবে মাত্র নীচে এসেছি।'

'তা হলে কি আপনার কোনও যমজ ভাই আছে নাকি?'

কৈলাসবাবু কীরকম যেন একটু অবাক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'সে কী, আপনাকে সেদিন বলিনি?'

'কী বলেননি?'

'কেদারের কথা? কেদার যে আমার যমজ ভাই।'

ফেলুদা সোফার উপর বসে পড়ল। কৈলাসবাবুরও মুখটা যেন কেমন শুকিয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আপনি কেদারকে দেখেছেন? সে ওখানে ছিল?'

'উনি ছাড়া আর কেউ হতেই পারেন না।'

'সর্ব্বনাশ!'

'কেন বলুন তো? কেদারবাবুর কি ওই পাথরটার উপর কোনও অধিকার ছিল?'

কৈলাসবাবু হঠাৎ কেমন যেন নেতিয়ে পড়লেন। সোফার হাতলে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা ছিল...তা ছিল। কেদারই প্রথম পাথরটা দেখে। আমি মন্দিরটা দেখি, কিন্তু দেবমূর্তির কপালে পাথর কেদারই প্রথম দেখে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী। একরকম আবদার করেই পাথরটা আমি নিই। অবিশ্যি মনে জানতুম ওটা আমার কাছে থাকলে থাকবে, কেদার নিলে ওটা বেচে দেবে, দিয়ে টাকাটা নষ্ট করবে। আর ওটার যে কত দাম সেটা আমি জেনেও কেদারকে জানাইনি। সত্যি বলতে কী, কেদার যখন বিদেশে চলে গেল, তখন আমার মনে একটা নিশ্চিন্ত ভাব এল। কিন্তু ওখানে হয়তো ও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি, তাই ফিরে এসেছে। হয়তো পাথরটা নিয়ে বিক্রি করে সেই টাকায় নতুন কিছু ব্যবসা ফাঁদবে।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ফেলুদা বলল, 'এখন উনি কী করতে পারেন সেটা বলতে পারেন?'

কৈলাসবাবু বললেন, 'জানি না। তবে আমার মুখোমুখি তো একবার তাকে আসতেই হবে। বাড়ি থেকে যখন বেরোই না, আর লিলি গাছের নীচে পাথর যখন রাখিনি, তখন সে আসবেই।'

'আপনি কি চান আমি এখানে থেকে একটা কোনও ব্যবস্থা করি?'

'না। তার কোনও প্রয়োজন হবে না। সে আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কিছু করবে বলে মনে হয় না। আর কথা যদি বলতে আসে, তা হলে ভাবছি পাথরটা দিয়েই দেব। আপনার কর্তব্য এখানেই শেষ। আপনি যে লাইফ রিক্স করে আজ ভিক্টোরিয়া

মেমোরিয়ালে গিয়েছিলেন, তার জন্যে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। আপনি বিলটা পাঠিয়ে দেবেন, একটা চেক আমি দিয়ে দেব।'

ফেলুদা বলল, 'লাইফ রিস্‌কই বটে। একটা গাড়ি তো পিছন থেকে এসে প্রায় আমাদের শেষ করে দিয়েছিল!'

আমার কনুইটা খানিকটা ছলে গিয়েছিল, আমি সেটা এতক্ষণ হাত দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু চেহার ছেড়ে ওঠবার সময় ফেলুদা সেটা দেখে ফেলল।

'ও কী রে, তোর হাতে যে রক্ত!' তারপর কৈলাসবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন—আপনার এখানে একটু ডেটল বা আয়োডিন হবে কি? এই সব ঘাগুলো আবার বড্ড চট করে সেপটিক হয়ে যায়।'

কৈলাসবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ইস—যা হয়েছে কলকাতার রাস্তাঘাট! দেখি, অবনীশকে জিজ্ঞেস করি!'

অবনীশবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে ডেটলের কথা জিজ্ঞেস করতেই উনি কেমন যেন একটু অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি যে এই দিন সাতেক আগেই আনলে। সে কি এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেল?'

কৈলাসবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'ওহো, তাই তো! এই দ্যাখ, খেয়ালই নেই। আমার কি আর মাথার ঠিক আছে?'

ডেটল লাগিয়ে কৈলাসবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখি ফেলুদা কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে ট্রামের দিকে না গিয়ে যাচ্ছে উলটো দিকে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলল, 'গণপতিদা'র কাছে একবার টেস্টম্যাচের টিকিটের কথাটা বলে যাই। এত কাছেই যখন এসেছি...'

কৈলাসবাবুর দুটো বাড়ি পরেই গণপতি ট্যাটার্জির বাড়ি। আমি ওর নাম শুনেছি ফেলুদার কাছে, কিন্তু দেখিনি কখনও। রাস্তার উপরেই সামনের ঘর, টোকা মারতেই গেঞ্জির উপর পুলোভার পরা একজন নাদুসনুদুস ভদ্রলোক দরজা খুলল।

'আরে, ফেলু মাস্টার যে—কী খবর?'

'একটা খবর তো বুঝতেই পারছেন।'

তা তো বুঝেছি, তবে সশরীরে তাগাদা না দিতে এলেও চলত। তোমার রিকোয়েস্ট কি ভুলি? যখন বলিচি দেব তখন দেবই।'

'আসার কারণ অবিশ্যি আরেকটা আছে। আপনার বাড়ির ছাত থেকে শুনিচি উত্তর কলকাতার একটা ভাল ভিউ পাওয়া যায়। একটা ফিল্ম কোম্পানির জন্য সেইটে একবার দেখতে চাইছিলাম।'

'স্বচ্ছন্দে! সটান সিঁড়ি দিয়ে চলে যাও। আমি এদিকে চায়ের আয়োজন করছি।'

চারতলার ছাতে উঠে পুব দিকে তাকাতেই দেখি—কৈলাসবাবুদের বাড়ি। একতলার বাগান থেকে ছাত অবধি দেখা যাচ্ছে। দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে—আর তার ভিতরে একজন লোক খুটখুট করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। খালি চোখেই বুঝতে পারলাম সেটা কৈলাসবাবুর বাবা। ছাতের ওপর ওই যে চিলেকোঠা—তার জানলার দিকে দেয়ালটা দেখে যাচ্ছে। দরজাটা বোধহয় উলটো দিকে।

দোতলার একটা বাতি জ্বলে উঠল। বুঝলাম সেটা সিঁড়ির বাতি। ফেলুদা বাইনোকুলার চোখে লাগাল। একজন লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। কে? কৈলাসবাবু। এতদূর থেকেও তার লাল সিল্কের ড্রেসিং গাউনটা দেখেই বোঝা যায়। অনেক সেকেন্ডের জন্য কৈলাসবাবুকে দেখা গেল না। তারপর হঠাৎ দেখি উনি ছাতে উঠে এসেছেন। আমরা দুজনেই চট করে একসঙ্গে নিচু হয়ে শুধু চোখদুটো পাঁচিলের উপর দিকে বার করে রাখলাম।

কৈলাসবাবু এদিক ওদিক দেখে চিলেকোঠার উলটোদিকে চলে গেলেন। তারপর ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। কৈলাসবাবুকে জানালায় দেখা গেল। উনি আমাদের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বুকের ভিতরে ভীষণ টিপ টিপ আরম্ভ হয়ে গেছে। কৈলাসবাবু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাটিতে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর কৈলাসবাবু আবার ঘরের বাতি নিভিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে চলে গেলেন।

ফেলুদা শুধু বলল, 'গোলমাল, গোলমাল।'

কৈলাস চৌধুরীর পাথর – ০৪

ফেলুদার এরকম অবস্থায় আমি ওকে বিশেষ কিছু বলতে সাহস পাই না। অন্য সময় মাথায় চিন্তা থাকলেও পায়চারি করে, কিন্তু আজ দেখলাম ও সটান বিছানায় শুয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে আছে। রাত সাড়ে নটায় দেখলাম ও নোট বইয়ে কী যেন হিজিবিজি লিখছে। ও আবার এ সব লেখা ইংরিজি ভাষায় কিন্তু গ্রীক অক্ষরে লেখে, আর সে অক্ষর আমার জানা নেই। এইটুকুই শুধু বুঝতে পারছিলাম যে, কৈলাসবাবুর বারণ সত্ত্বেও ও এই পাথরের ব্যাপারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘুমোতে রাত হয়েছিল বলেই বোধয় সকালে নিজে থেকে ঘুমটা ভাঙেনি–ভাঙল ফেলুদার ঠেলাতে।

'এই তোপ্‌সে ওঠ ওঠ, শ্যামপুকুর যেতে হবে।'

'কীসের জন্য?'

'ফোন করেছিলাম। কেউ ধরছে না। গণ্ডগোল মনে হচ্ছে।'

দশ মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সিতে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললাম শ্যামপুকুরের দিকে। গাড়িতে ফেলুদা শুধু একটা কথাই বলল, 'কী সাংঘাতিক লোক রে বাবা! আরেকটু আগে বুঝতে পারলে বোধহয় গণ্ডগোলটা হত না।'

কৈলাসবাবুর বাড়িতে পৌঁছে ফেলুদা বেল-টেল না টিপেই ভেতরে চলে গেল। অবিশ্যি দরজাটা যে খোলাই ছিল সেটাও আমাদের ভাগ্য। সিঁড়ি পেরিয়ে অবনীশবাবুর ঘরের সামনে পৌঁছতেই চক্ষুস্থির। টেবিলের সামনে একটা চেয়ার উলটে পড়ে আছে, আর তার ঠিক পাশেই মেঝেতে হাত দুটো পিছনে জড়ো করে বাঁধা আর মুখে রুমাল বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন অবনীশবাবু। ফেলুদা হুমড়ি দিয়ে পড়ে আধ মিনিটের মধ্যে দড়ি রুমাল খুলে দিতেই ভদ্রলোক বললেন,–'উঃ–থ্যাঙ্ক গড!'

ফেলুদা বলল, 'কে করেছে এই দশা আপনার?'

ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসে বললেন, ‘মামা! কৈলাসমামা! মামার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—সেদিন বলছিলাম না আপনাকে? ভোরে এসে বসেছি ঘরে—বাতি জ্বালিয়ে কাজ করছিলাম। মামা ঘরে ঢুকেই আগে বাতি নিভিয়েছেন। তারপর মাথায় একটা বাড়ি। তারপর আর কিচ্ছু জানি না। কিছুক্ষণ হল জ্ঞান ফিরেছে—কিন্তু নড়তে পারি না, মুখে শব্দ করতে পারি না—উঃ!’

‘আর কৈলাসবাবু?’ ফেলুদা প্রায় চিৎকার করে উঠল।

‘জানি না!’

ফেলুদা এক লাফে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমিও ছুটলাম তার পিছনে।

একবার বৈঠকখানায় ঢুকে কাউকে না দেখে, তিন ধাপ সিঁড়ি এক লাফে উঠে দোতলায় পৌঁছে ফেলুদা সটান কৈলাসবাবুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। খাটের চেহারা দেখে মনে হল সেখানে লোক শুয়েছিল, কিন্তু ঘর এখন খালি। আলমারির দরজা দেখি হাঁ করে খোলা। ফেলুদা দৌড়ে গিয়ে দেরাজ খুলে যে জিনিসটা বার করল সেটা মখমলের সেই নীল বাক্স। খুলে দেখা গেল ভিতরে সেই পাথর যেমন ছিল তেমনিই আছে।

এতক্ষণে দেখি অবনীশবাবু এসে হাজির হয়েছেন, তার মুখের অবস্থা শোচনীয়। তাকে দেখেই ফেলুদা বলল, ‘ছাতের ঘরের চাবি কার কাছে?’

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন, ‘সে-সে-সেতো মামার কাছে।’

‘তবে চলুন ছাতে’—বলে ফেলুদা তাকে হিড় হিড় করে টেনে বার করে নিয়ে গেল।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তিনজনে ছাতে উঠে দেখি—চিলেকোঠার দরজা বাইরে থেকে তালা দিয়ে বন্ধ। এইবার দেখলাম ফেলুদার গায়ের জোর। দরজা থেকে তিন হাতে পিছিয়ে কাঁধটা আগিয়ে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে চার বার ধাক্কা দিতেই কড়াগুলো পেরেক সুদ্ধ উপড়ে বেরিয়ে এসে ধরজাটা ঝটাং করে খুলে গেল।

ভিতরে অন্ধকার। তিনজনেই ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। ক্রমে চোখটা সয়ে আসতে দেখলাম—এক কোণে অবনীশবাবুর মতো দড়ি বাঁধা মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন—ইনি কে? কৈলাস চৌধুরী, না কেদার চৌধুরী?

দড়ির বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁকে কোলপাঁজা করে নিয়ে ফেলুদা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নেমে কৈলাসবাবুর ঘরে নিয়ে বিছানার উপর শোয়াল। ভদ্রলোক তখন ফেলুদার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে ক্ষীণ গলায় বললেন, 'আপনিই কি...?'

ফেলুদা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমারই নাম প্রদোষ মিত্তির। চিঠিটা বোধ হয় আপনিই আমাকে লিখেছিলেন–কিন্তু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয়নি।...অবনীশবাবু, এঁর জন্য একটু গরম দুধের ব্যবস্থা দেখুন তো।'

আমি অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে আছি। ইনিই তা হলে কৈলাস চৌধুরী! ভদ্রলোক বালিশের উপর ভর দিয়ে খানিকটা সোজা হয়ে বসে বললেন, 'শরীরে জোর ছিল, তাই টিকে আছি। অন্য কেউ হলে...এই চার দিনে...!'

ফেলুদা বলল, 'আপনি বেশি স্ট্রেন করবেন না।'

কৈলাসবাবু বললেন, 'কিছু কথা তো বলতেই হবে–নইলে ব্যাপারটা আপনার কাছে পরিস্কার হবে না। আপনার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হবে কী করে–যেদিন চিঠি দিলুম আপনাকে, সেইদিনই তো ও আমাকে বন্দি করে ফেলল। তাও চায়ের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে অজ্ঞান করে–নইলে গায়ের জোরে পারত না।'

'আর সেদিন থেকেই উনি কৈলাস চৌধুরী সেজে বলেছিলেন?'

কৈলাসবাবু দুঃখের ভাব করে মাথা নেড়ে বললেন, 'দোষটা আমারই, জানেন। বানিয়ে বানিয়ে বড়াই করাটা বোধহয় আমাদের রক্তে মিশে আছে। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটা পাথর কিনেছিলুম জব্বলপুরের বাজার থেকে। কী দুর্মতি হল, ফিরে এসে দাঁচার জঙ্গলের এক দেবমন্দিরের গল্প ফেঁদে কেদারকে তাক লাগিয়ে দিলুম। সেই থেকেই ওর ওইটের উপর লোভ। আমার ভাগ্যটা ও সহ্য করতে পারেনি। অনেক কিছুই সহ্য করতে পারেনি। বোধহয় ভাবত–দুজনে যমজ ভাই–চোখে দেখে কোনও তফাত করা যায় না, অথচ আমার গুণ, আমার রোজগার, আমার ভাগ্য–এস ব্যাপারে ওর সঙ্গে এত তফাত হবে কেন? ও নিজে ছিল বেপরোয়া রেকলেস। একবার তো নোট জাল করার কেসে পড়েছিল। আমিই কোনও রকমে ওকে বাঁচাই। বিলেত গেল আমারই কাছ থেকে টাকা ধার করে। ভাবলুম আপদ গেল। ঐ সাতদিন আগে–গত মঙ্গলবার–বাড়ি ফিরে দেখি পাথরটা নেই।

তার কথা মনেই হয়নি। চাকরদের উপর চোটপাট করলুম—কোনও ফল হল না। বিষ্যুদবার সকালে আপনাকে চিঠি দিলাম। সেদিনই রাত্রে ও এল। বাজারে যাচাই করে জেনেছে ও পাথরের কোনও দাম নেই, অথচ ও দেখেছিল লাখ টাকার স্বপ্ন। ক্ষেপে একেবারে লাল। টাকার দরকার—অন্তত বিষ হাজার! চাইল—রিফিউজ করলুম। তাতে ও আমাকে অজ্ঞান করে বন্দি করল। বলল যতদিন না টাকা দিই তদ্দিন ছাড়বে না—আর সে ক'দিন ও কৈলাস চৌধুরী সেজে বসে থাকবে—কেবল আদালতে যাব না—অসুখ বলে ছুটি নেবে।'

ফেলুদা বলল, 'আমি যখন আপনার চিঠি পেয়ে এসে পড়লাম, তখন ভদ্রলোক একটু মুশকিলে পড়েছিলেন, ইয়াও আ,আদের দশ মিনিট বসিয়ে রেখে একটা হুমকি চিঠি, আর একজন কাল্পনিক শত্রু খাড়া করলেন। এইটে না করলে আমাদের সন্দেহ হত। অথচ আমি থাকলেও বিপদ—তাই আবার টেলিফোনে হুমকি দিয়ে আর গাড়ি চাপা দিয়ে আমাদের হটাতেও চেষ্টা করলেন!'

কৈলাস ভ্রুকুটি করে বললেন, 'কিন্তু আমি ভাবছি, কেদার এ ভাবে হঠাৎ আমাকে রেহাই দিয়ে চলে গেল কেন। আমি তো কাল রাত অবধি ওকে টাকা দিতে রাজি হইনি। ও কি শুধু হাতেই চলে গেল?'

অবনীশবাবু যে কখন দুধ নিয়ে হাজির হয়েছেন তা লক্ষই করিনি। হঠাৎ ভদ্রলোকের চিৎকার শুনে চমকে উঠলাম।

'খালি হাতে যাবেন কেন তিনি? আমার টিকিট—আমার বহুমূল্য ভিক্টোরিয়ার টিকিট নিয়ে গেছেন তিনি।'

ফেলুদা অননীশবাবুর দিকে চেয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, 'সে কী—সেটা গেছে নাকি?'

'গেছে বইকি! আমাকে শেষ করে দিয়ে গেছেন কেদার মামা।'

'কত দাম যেন বলছিলেন টিকিটটার?'

'বিশ হাজার।'

'কিন্তু'—ফেলুদা অবনীশবাবুর দিকে ঝুঁকে পড়ে গলাটা নামিয়ে বলল, 'ক্যাটালগে যে বলছে ওটার দাম পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়।'

অবনীশবাবুর মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ফেলুদা বলল, ‘আপনার মধ্যেও তো চৌধুরী বংশের রক্ত রয়েছে—তাই না? আপনিও বোধহয় একটু রং চড়িয়ে কথা বলতে ভালবাসেন?’

ভদ্রলোক এবার একেবারে ছেলেমানুষের মতো কাঁদো কাঁদো মুখ করে বললেন, ‘কী করি বলুন! তিন বছর ধরে চার হাজার ধুলোমাখা চিঠি ঘেঁটেও যে একটা ভাল টিকিট পেলাম না! তাও তো মিথ্যে বলে লোককে অবাক করে কিছুটা আনন্দ পাওয়া যায়।’

ফেলুদা হো হো করে হেসে উঠে অবনীশবাবুর পিঠ চাপড়ে বললেন, ‘কুছ পরোয়া নেই। আপনার কেদার মামাকে আপনি যে টাইটটি দিলেন, সেটার কথা ভাবলেই দেখবেন প্রচুর আনন্দ পাবেন।...যাক গে, এবার দমদম এয়ারপোর্টে একটা টেলিফোন করে দিন। কেদারবাবু পালাবেন আন্দাজ করে আজ সকালে এয়ার ইন্ডিয়াতে ফোন করে জেনেছি আজই একটা বোম্বাই-এর প্লেনে ওঁর বুকিং আছে। পুলিশ থাকবে ওখানে, তাই পালাবার কোনও রাস্তা নেই। ভাগ্যে তপেশের কনুই ছলেছিল! ডেটলের ব্যাপারটাতেই আমার ওর উপর প্রথম সন্দেহ হয়।’

কৈলাস চৌধুরীর পাথর – ০৫

কেদারবাবুকে গ্রেপ্তার করতে কোনও বেগ পেতে হয়নি, আর অবনীশবাবুও তার পঞ্চাশ টাকার টিকিটটা ফেরত পেয়েছিলেন। ফেলুদা যা টাকা পেল, তাই দিয়ে আমাদের তিনবার রেস্টুর্যান্টে খাওয়া আর দুটো সিনেমা দেখার পরেও ওর পকেটে বেশ কিছু বাকি রইল।

আজ বিকেলে বাড়িতে বসে চা খেতে খেতে ফেলুদাকে বললাম, 'ফেলুদা, একটা জিনিস আমি ভেবে বার করেছি, সেটা ঠিক কি না বলবে?'

'কী ভেবেছিস শুনি।'

'আমার মনে হয় কৈলাসবাবুর বাবা বুঝতে পেরেছিলেন যে কেদারবাবু কৈলাসবাবু সেজে বসে আছেন, আর সেই জন্যেই সেদিন ওর দিকে কটমট করে চাইছিলেন। বাবারা নিশ্চয়ই নিজেদের যমজ ছেলেদের মধ্যে তফাত ধররে পারে–তাই না?'

'এক্ষেত্রে তা যদি নাও হয়, তা হলেও, তোর ভাবনাটা আমার ভাবনার সঙ্গে মিলে গেছে বলে আমি তোকে সম্মানিত করছি'–এই বলে ফেলুদা আমার প্লেট থেকে একটা জিলিপি তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিল।

(সমাপ্ত)